একক ২(ক) ❑ সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী পর্বে ১৮৫৮ সালের মহারানীর শাসনের ঘোষণা এবং ১৮৬১ সালের আইন

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণের পটভূমিকা

২(ক).৩ ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণার (Queens' Proclamation of 1858) তাৎপর্য

২(ক).৪ ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট ও তার গুরুত্ব

২(ক).৫ সারাংশ

২(ক).৬ অনুশীলনী

২(ক).৭ গ্রন্থপঞ্জী

২(ক).০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন
- কোন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে মহারানীর শাসন প্রচলিত হয়?
- জনজীবনে এর গুরুত্ব কি ছিল?
- ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট কেন চালু হয়?
- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কি ছিল?

২(ক).১ প্রস্তাবনা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ভারতের ইতিহাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে দেশীয় রাজন্যবর্গের পরাজয়ের ইতিহাস। এই পর্ব প্রমাণ করে যে ভারতের রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট প্রায়। এই সুযোগে কোম্পানি

তার আধিপত্য বিস্তার করতে স(ম হয়। কিন্তু ঠিক একশত বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে কোম্পানির শাসনের বি(দ্ধে সামগ্রিকভাবে না হলেও ব্যাপকভাবে ভারতে এক মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়। টলায়মান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদিও এই বিদ্রোহ দমন করে, তাহলেও মহাবিদ্রোহ তাদের সশঙ্কিত করে তোলে। মূল্যায়ন করা হয় একশত বৎসরের কোম্পানির শাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই প্রে(িতে অবসান হয় কোম্পানির শাসনপর্বের। ভারতের শাসনভার সরাসরি ন্যস্ত হয় ইংল্যন্ডে(েরীর উপরে।

২(ক).২ ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণের পটভূমিকা

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ও ব্যাপ্তি ইংল্যান্ডের জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইংল্যান্ডে এই ধরণের সমালোচনাও করা হতে থাকে যে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ও তদ্‌জনিত লাভ—কাজেই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্ত(েপ করা কোম্পানির প(ে অনুচিত কাজ হয়েছে। লর্ড পামারস্টোন তাঁর বিখ্যাত ভাষণে কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনাকে অত্যন্ত দায়িত্বহীন বলে অভিযোগ করেন। লর্ড পামারস্টোন উন্নততর শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রচলন করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে বিল উপস্থাপন করেন। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি তাদের একশত বৎসরের একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। কোম্পানির বক্ত(ব্য ছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের উত্থানের জন্য কোম্পানি একা দায়ী নয়। কারণ যে কোনও সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিতেন ব্রিটেনের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্যবৃন্দ। কাজেই মহাবিদ্রোহ যদি হয়েই থাকে তার দায়ভাগ ব্রিটেনের উপরও বর্তায়।

একথা অনস্বীকার্য যে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট জারী করার পর থেকেই কোম্পানির (মতা ধীরে ধীরে কমতে শু(করেছিল। এরকম প্র(ও উঠেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্যিক সংস্থার উপরে ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া যথাযথ হবে কি না। ইংল্যান্ডে টোরি এবং হুইগ উভয় দলই কোম্পানির আধিপত্য খর্ব করার প(ে ছিল। অর্থাৎ কোম্পানির বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়েই এসেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোম্পানির অন্তিম মুহূর্তটিকে ত্বরান্বিত করে মাত্র।

২(ক).৩ ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণার তাৎপর্য

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে মহারানীর তরফ থেকে সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয় ভারত সচিবকে। কোম্পানির সামরিক ও নৌশক্তি(র নিয়ন্ত্রণ সরাসরি মহারানীর দপ্তরের উপর ন্যাস্ত হয়। বোর্ড অফ কন্ট্রোল এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্‌দের আর কোনও অস্তিত্ব রইল না। ভারতের যাবতীয় দায়িত্ব সুচা(রূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি কাউন্সিল বা উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়। ভারত সচিব এই কাউন্সিলের সাহায্যে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মূলত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তাঁর কাজের জবাবদিহি একমাত্র পার্লামেন্টের কাছেই করতে হত।

ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫। এদের মধ্যে সাতজনকে নির্বাচিত করতেন কোর্ট অফ ডিরেক্টরসরা। বাকী আটজনকে মনোনীত করতেন ব্রিটিশ সরকার। কাউন্সিলের অর্ধেকের বেশি সদস্য হতেন তাঁরাই যাঁদের ভারতে অবস্থানকালের ব্যাপ্তি ছিল দশ বছরেরও বেশি। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা প্রত্যেকেই তাঁদের বেতন পেতেন ভারতীয় রাজস্ব থেকে।

এইচ. এস. ক্যানিংহাম মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় প্রশাসন ব্রিটিশরাজের হাতে চলে আসাটা'rather a formal than a substantial change' আসলে বড় কোনও মৌলিক পরিবর্তন এই (মতা হস্তান্তরের ফলে হয়নি। ভারত সচিব যেন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতির নতুন সংস্করণ এবং ডিরেক্টর সভাই যেন পরবর্তীকালে কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারত সচিবের হাতে পূর্ণ (মতা অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিল। তাছাড়া ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বহুবিধ সমস্যা নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি সম্পর্কে মাথা ঘামানোর অবকাশ তাদের ছিল না। কাজেই বলা যেতে পারে যে মহারানীর রাজত্বে ভারতীয়দের অবস্থানগত কোনও পার্থক ঘটল না।

তবে মহারানীর ঘোষণায় দেশীয় রাজাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তাদের রাজ্য অধিগ্রহণ করা হবে না এবং হিন্দু রাজাদের উত্তরাধিকারত্ব সংত্র(াস্ত আইনে দত্তক পুত্রের বৈধ অধিকার মেনে নেওয়া হবে। এছাড়া মহারানীর ঘোষণায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্ত(েপ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় রীতিনীতি সংস্কারের কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসেবে ভারতীয়রা ইংরেজদের মতোই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে ঘোষণা করা হয়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রে(াপটে যে আইন গৃহীত হয় তাতে সামরিক পুনর্গঠনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেশীয় সিপাহীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যে সম্ভবপর নয় এই তথ্য ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ফলে তারা সামরিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে কিছু বিশেষ নীতি গ্রহণ করে। দেশীয় সিপাহীদের সংখ্যা হ্রাস করে ইউরোপীয় সিপাহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে কোনও চিড় ধরেনি। এই ঐক্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্বের প(অনুকূল নয় একথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সরকার ভারতে বিভাজন নীতি অনুসরণ করে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। সামরিক দিক দিয়ে এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে গু(ত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে দেশীয় সিপাহীদের সরিয়ে ইউরোপীয় সিপাহীদের মোতায়েন করা হয়। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ সর্বত্র সেনাবাহিনীতে পূর্বের মতই উচ্চপদগুলি ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে রইল। অর্থাৎ মহারানীর ঘোষণা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মূল চরিত্রে কোনও পরিবর্তন আনেনি।

মহারানীর ঘোষণার প্রে(িতে সামরিক বাহিনীর পুনর্বিন্যাস বি(-ষণ করাকালীন মনে রাখতে হবে যে ভারতের যে অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল সেই অঞ্চলের লোকজনদের সামরিক বাহিনীতে স্থান না দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। শিখ, গোর্খা, পাঠান যারা ইংরেজ সরকারকে মহাবিদ্রোহের সময়ে সাহায্য করেছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তাদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, ভারত সচিব চার্লস উড তৎকালীন বড়লাট ক্যানিংকে বলেছিলেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভেদ মাথায় রেখে এমনভাবে গড়ে

তুলতে হবে যাতে তাদের মধ্যে কোনওরকম ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে না পারে। এছাড়া গোলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে রইল ইংরেজদের হাতে।

মহারানী তাঁর ঘোষণায় ব্যক্ত করেছিলেন যে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে আগ্রাসন নীতি অনুসৃত হবে না। তবে এই প্রসঙ্গে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে মহারানীর এই ঘোষণা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্বেই ইংরেজরা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি থেকে শুরু করে স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছিল। কাজেই নতুন করে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া ইংরেজরা একথাও বুঝেছিল যে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদার সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন কার একান্ত আবশ্যক। কারণ নিজ নিজ অঞ্চলের জনসাধারণের উপরে এদের প্রভাব অপরিসীম। মহাবিদ্রোহ থেকে ইংরেজরা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। কাজেই দত্তক প্রথাকে পুনরায় স্বীকৃতি দানের কথা মহারানীর ঘোষণায় বলা হয়। তবে এইসব দত্তক পুত্রদের সিংহাসনে বসার পূর্বে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন নিতে হত।

দেশীয় রাজ্যগুলি মহারানীর ঘোষণায় আশ্বস্ত হলেও এই ঘোষণার মূল অর্থ ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুস প্রভুত্ব বিস্তার। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রশাসনিক কাজের তদারকের জন্য ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হতেন। দেশীয় রাজাদের ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোভুক্ত করার জন্য সর্বত্র একই ধরণের ডাক ও তার ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবহার করা হত। রেলপথে প্রতিটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র নীতি বা নিরাপত্তা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারটি পরিচালনার ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে। আবার ইংরেজ সরকার ইচ্ছে করলেই যে কোনও দেশীয় রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ঐ বংশের অন্য কাউকে সিংহাসনে বসাতে পারত। এই রকম উদাহরণ যথেষ্ট দেওয়া হয়।

মহাবিদ্রোহ কোম্পানির অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সরকারি আয়ের হৃদপিন্ড ছিল ভূমিরাজস্ব। মহাবিদ্রোহের সময়ে রাজস্ব আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহের পরে প্রশাসনিক দায়িত্ব যখন ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে আসে, তখন অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বাৎসরিক বাজেট, নিয়মিত হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থা, সরকার অর্থ দপ্তরের পুনর্গঠন এবং সরকারি অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপরে আয়কর ধার্য হয়। ভারতের বাণিজ্য নীতির উপরে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতকে শোষণ করে ইংরেজ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

মহারানীর ঘোষণায় যদিও বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—তা সত্ত্বেও এই ঘোষণা ব্যাপকভাবে কার্যকরী হতে পারেনি। কারণ শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এতই তিক্ত ও ঘৃণার ছিল যে এই বিদ্বেষ মহারানীর উদার ঘোষণা মুছে দিতে পারেনি। ইংরেজদের কৌশলী চরিত্রটি ভারতীয়দের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব ছিল। যেভাবে পলাশীর যুদ্ধ থেকে সিপাহী

বিদ্রোহের পূর্ব পর্য্যন্ত কোম্পানি ভারতীয়দের বঞ্চনা করে এসেছিল তা বিস্মৃত হওয়া সহজ ছিল না। তারা মহারানীর মেনে নিয়েছিল খানিকটা নি(পোয় হয়ে। মহাবিদ্রোহ তাদের এই শি(া দিয়েছিল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নামার যোগ্যতা তাদের নেই। কাজেই ইংরেজদের সাথে তাদের মানিয়ে চলতে হবে। কিন্তু তখন থেকেই অবচেতন মনে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ-বিরোধী চিন্তাধারা কাজ করেছিল। যদিও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অনেক পরে।

মহারানীর ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ জীবনে ইংরেজদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। প্রকৃতপ(ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একথা প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজজীবনে হস্ত(েপ করার ফল ভালো হয়নি। কাজেই প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে যদি নিস্তরঙ্গ রাখা যায় তাহলে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে কায়েমী করে ফেলতে সুবিধা হবে।

২(ক).৪ ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল্ এ্যাক্ট ও তার গুরুত্ব

ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাস ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ পদ(েপ। বস্তুতঃপ(ে ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনের মধ্যে যে গলদগুলি ছিল তা দূর করার জন্যই ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ছিল এই যে আইন পরিষদ বা Legislative Council-এ ভারতীয়দের কোন স্থানই ছিল না। কাজেই ভারতীয়রা ইংরেজদের প্রবর্তিত আইনবিধি সম্পর্কে কি ধরণের চিন্তাভাবনা করছে তা জানার কোনও উপায় ছিল না। স্যর সৈয়দ আহমেদ এই আইন সম্পর্কে মনে করেছিলেন যে যদি কোনও অপ্রিয় পদ(েপও গ্রহণ করা হত তাহলেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের প(ে প্রতিবাদ জানানো সম্ভব ছিল না। কারণ আইন পরিষদে ভারতীয়দের তরফে কোনও প্রতিনিধি ছিল না। স্যর চার্লস উড আইন সভা বা Legislative Council-এর স্বাধীন মনোভাব পছন্দ করেননি। তিনি বলেছিলেন যে আইন পরিষদ কাজেকর্মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যেন একটি (ুদ্রতম সংস্করণে পরিণত হয়েছে। ফলে ইংরেজ প্রশাসনের তরফেও এই আইন সম্পর্কে কিছু বিরূপতা ছিল। এই কারণে ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা হয়।

প্রশাসনিক ব্যাপারেও ইংরেজ রাজ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আইন প্রণয়ন (মতা রদ করে দিয়ে যাবতীয় (মতা কলকাতায় রেখে দেওয়া হলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রশাসন অসন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থা আরও তিক্ত(হয়ে ওঠে আয়কর সংত্র(ান্ত বিলকে কেন্দ্র করে। মাদ্রাজে এই সমস্যাটি হয়েছিল এবং ইংরেজ সরকার এই প্রসঙ্গে বুঝতে পেরেছিল প্রশাসনিক দুর্বলতাগুলির দূর করে ব্রিটিশ রাজত্ব সুসংহত করতে গেলে আর একটি আইন পাস করা দরকার।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্টের শর্ত অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন করা হয়। অর্থ দপ্তর ও আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য দুজনকে ব্রিটিশ সরকার

নিযুক্ত(করতেন। ভারত সচিব বাকী তিনজন সদস্যকে মনোনীত করতেন। এদের ভারতে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কম করে দশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ছিল। Extra ordinary সদস্য হিসাবে এই কাউন্সিলে, Commander-in-chief ছিলেন বা সেনাপতি। এদের প্রত্যেকেরই দায়িত্বকালের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছরের।

এই প্রথম আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে কাউন্সিল গঠিত হয় যেখানে ভারতীয়দের স্থান ছিল। ছয় থেকে বারজনের মধ্যে সদস্যবৃন্দ নিয়ে যে Executive council গড়ে ওঠে সেখানে ছয় জন বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে ভারতীয়দেরও আসন ছিল। তবে ভারতীয় সদস্যদের নির্বাচিত করতেন গভর্নর জেনারেল। বেসরকারি সদস্যরা আইন পরিষদে দুই বছরের জন্য থাকতেন। কিছু নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে গেলে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন একান্ত আবশ্যক ছিল। আবার ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করলে আইৰ পরিষদের প্রণীত যে কোনও আইন নাকচ করে দিতে পারতেন।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের হাতে পুনরায় আইন প্রণয়নের (মতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এ(ত্রেও গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন ছিল আবশ্যক। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বা পাঞ্জাবেও আইন পরিষদ গঠন করার কথা ভাবা হয়। গভর্ণর জেনারেল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ইচ্ছে করলেই নতুন প্রদেশ গঠন করতে পারতেন। লেফটেনান্ট গভর্ণর নিয়োগের (মতা তাঁর উপরে ছিল।

নিঃসন্দেহে ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই এ্যাক্ট সর্বপ্রথম ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তবে ভারতীয় সদস্যরা ছিলেন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়। দেশীয় রাজারা, দেওয়ান বা জমিদাররা আইন পরিষদের বেসরকারি সদস্যরূপে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন। কাজেই জনপ্রতিনিধি বলতে যা বোঝায় এঁরা তা ছিলেন না। ভারতবাসীর অসন্তোষ বা চাহিদা প্রকৃতপ(ে কি তা জানা সম্ভব ছিল না এই সদস্যদের মাধ্যমে। কারণ সাধারণ মানুষের চাহিদা জানার মতো মানসিক সেতু সমাজের উপরতলার ব্যক্তি(দের সাথে গড়ে ওঠে নি। উপরন্তু কাউন্সিলের মিটিং-এ আসার আগ্রহও অধিকাংশ ভারতীয় সদস্যদের ছিল না। হতে পারে তাঁদের হাতে বিশেষ কোনও (মতা ছিল না বলেই উৎসাহের অভাব ছিল।

তবে একথা বলা যায় আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় সদস্যদের আইন পরিষদে যোগদান প্রহসনে পরিণত হলেও পরবর্তীকালে প্রশাসন যন্ত্রে অংশ গ্রহণের আকাঙ্খার বীজ হয়েছিল এখান থেকেই। কাজেই এই আইনের গু(ত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট গভর্ণর জেনারেলকে সর্বময় কর্তৃত্বে পরিণত করে। আইন পরিষদ গঠিত হলেও প্রকৃত (মতা নিয়ন্ত্রণ করতেন গভর্ণর জেনারেল। তবে ভবিষ্যতের ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামো আইন পরিষদকে কেন্দ্র করে কিভাবে গড়ে উঠতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট।

২(ক).৫ সারাংশ

এই একটিতে ১৮৫৮ সালের মহারানী ঘোষণার তাৎপর্য এবং ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্টের গু(ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। যদিও সিপাহী বিদ্রোহ বা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে মহারানীর শাসনের আওতায় ভারতকে এনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল তাহলেও এই সময়ে যে আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল তার কিছু সাংবিধানিক গু(ত্ব ছিল। ভারতীয়রা এই আইনের ফলেই অবচেতন মনে প্রশাসনে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শু(করেছিল—যার পরিণতি পরবর্তী পর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়ে ল(িত হয়।

২(ক).৬ অনুশীলনী

ক। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১। কোন পরিপ্রে(িতে ১৮৫৮ সালে মহারানীর ঘোষণা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল আলোচনা ক(ন।

২। ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণা ভারত ইতিহাসে কতটা গু(ত্বপূর্ণ ছিল দেখান।

৩। ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গু(ত্বপূর্ণ পদ(েপ—বি(ে-ষণ ক(ন।

খ। অগ্রগতি যাচাই করুন (সঠিক উত্তরটিকে (✓) চিহ্ন দিন)

১। ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণার ফলে কোম্পানির রাজত্ব আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

২। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারিবৃন্দ যারা ভারতে নিযুক্ত(ছিলেন তাদের বেতন দেওয়া হত ইংল্যান্ড থেকে।

৩। মহারানীর ঘোষণায় দত্তক পুত্রদের উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত (েত্রে বৈধ বলে অনুমোদন করা হয়।

৪। মহাবিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনে বিভাজন নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট (১৮৬১) আইন পরিষদে সাধারণ ভারতীয় জনপ্রতিনিধি রাখার কথা বলেন।

২(ক).৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Majumdar— R.C. Roy Chowdhury, H.C. Dutta, K.K.—An Advanced History of India.
2. Spear, P.— Modern India.
3. T. B. Metclaf—Aftermath of the Revolt. E. Thomson.
4. Garatt. G.T.—British rule in India.
5. A.B. Keith—Constitutional Development of India.
6. R.C. Majumdar ed : History and culture of the Indian people, Vol. IX. British Paramountey and Indian Renaissance in India.
7. A.C. Banerjee : Constitutional History of India.

একক ২(খ) ❑ ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ও উপজাতি বিদ্রোহ

গঠন

২(খ).০ উদ্দেশ্য

২(খ).১ প্রস্তাবনা

২(খ).২ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ

২(খ).৩ কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকা ও প্রকৃতি

২(খ).৪ ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট ও তার গুরুত্ব

২(খ).৪.১ নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি ও নেতৃত্ব

২(খ).৪.২ নীল বিদ্রোহের ফলাফল

২(খ).৫ পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান

২(খ).৬ মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ

২(খ).৭ উপজাতি বিদ্রোহের পটভূমিকা

২(খ).৭.১ খারওয়ার আন্দোলন

২(খ).৭.২ মুণ্ডা বিদ্রোহ

২(খ).৭.৩ ওঁরাও বিক্ষোভ

২(খ).৮ মোপলা বিদ্রোহ

২(খ).৯ অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বিদ্রোহ

২(খ).১০ সারাংশ

২(খ).১১ অনুশীলনী

২(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

২(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বি(োভের কথা জানতে পারবেন।
- এইসব বি(োভের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- এই বি(োভগুলির ব্যাপ্তি ও ব্রিটিশ প্রতিত্রি(য়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

২(খ).১ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ শাসন যে ভারতীয়রা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেনি তার প্রমাণ ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান, নীল বিদ্রোহের মত প্রতিবাদী বি(োভ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী ও উপজাতি মানুষের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যদিও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মত ব্যাপ্তি এই আন্দোলনগুলির ছিল না, তাহলেও জনগণ যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ত্র(মশই হতাশ ও তিক্ত(হয়ে উঠেছে তার সা(্য মেলে এই ধরনের অভ্যুত্থানগুলিতে।

২(খ).২ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ

ইংরেজ শাসনে সর্বাপে(া বেশি (তিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায়। শোষণ যন্ত্রে নিপীড়িত হয়েছিল আদিবাসী মানুষজন। রজনীপাম দত্ত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় উল্লেখ করেছেন কৃষকদের উপর অপরিসীম করের ভার চাপানোর কথা। এদের অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা দিতে হ'ত। জমিদাররাও অনেকেই প্রাপ্য কর ছাড়াও জোর করে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করতেন। টাকার অভাবে খাজনা মেটানোর জন্য কৃষকদের শরণাপন্ন হতে হত মহাজনদের কাছে। ফলে অবস্থা হয়ে পড়ে শোচনীয়। মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে জমিদার ও সরকারের খাজনা মেটানোর চেষ্টা করলেও মহাজনের দেনা মেটানো কৃষকদের প(অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বন্ধকী জমি মহাজনের হাতে চলে যায় এবং কৃষক হয়ে পড়ে ভূমিহীন। তাদের এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার বা জমিদার কেউই এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু জোর করে নীলের চাষ করতে কৃষকদের বাধ্য করে ইংরেজ সরকার—যদিও এই চাষ বাংলার কৃষকদের কাছে লাভজনক ছিল না। জমিদার, সরকার ও মহাজন এই ত্রিমুখী অত্যাচারের চাপে কৃষকদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল মর্মান্তিক।

আদিবাসী ও উপজাতি বি(োভের প্রে(াপট ছিল অন্য ধরনের। আদিবাসী সমাজে খাজনার দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে—এখানে ব্যক্তি(গত মালিকানার কোনও ব্যাপার ছিল না। গ্রামের প্রধান বা মোড়ল গ্রামবাসীদের সকলের হয়ে খাজনা দিত। এই ধরনের সামাজিক পরিকাঠামোতে জমিদার, মহাজন ইত্যাদি শব্দগুলি ছিল অপরিচিত। এই সহজ সরল ভূমি ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব নীতি আদিবাসী সমাজে প্রবল বি(োভের সৃষ্টি করে। জমিদার বা মহাজন সম্প্রদায় এই সুযোগে তাদের সমাজে প্রবেশ করে। আদিবাসীদের দৃষ্টিতে এরা ছিল বহিরাগত। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব মেটাতে গিয়ে আদিবাসীরা এদের কাছেই জমি বন্ধক রেখে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে তারাও ত্র(মশ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে।

২(খ).৩ উদ্দেশ্য

ভারতে ব্রিটিশ শাসন পর্বে কৃষক বিদ্রোহ অধ্যায়টি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে শোষিত হচ্ছিল। অবশেষে তাদের অভাব অভিযোগ যখন সহ্যের সীমা অতিত্র(ম করে—তখনই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। রণজিত গুহ তাঁর Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে কৃষকরা বিদ্রোহকে বেছে নিয়েছিল শেষ অস্ত্র হিসাবে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অভ্যুত্থান ঘটায়নি। তারা জানতো তারা কি চায়। হয়তো বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্রোহের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য ছিল—তাহলেও তাদের মানসিকতা ছিল এক—এই বিদ্রোহ ছিল শোষণ ও নিষ্পেষণের বি(দ্ধে।

কৃষক বিদ্রোহগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন ক্যাথলিন গাফ। তিনি বলেছেন—(১) কৃষক বিদ্রোহ এক ধরনের পুন(জ্জীবনবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো এবং প্রকৃত শাসককে পুনরায় (মতায় ফিরিয়ে আনা। (২) কৃষক বিদ্রোহ এক ধরনের ধর্মাশ্রয়ী অভ্যুত্থান। (৩) কৃষকবিদ্রোহ এক ধরণের গণবিদ্রোহ—যেখানে অভাব অভিযোগের বি(দ্ধে সকল সোচ্চার হয়ে উঠেছিল (৪) লুঠপাঠ দস্যুতা কৃষক বিদ্রোহের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল—Eric Hobsbawm একে বলেছেন Social bandity. (৫) কৃষকবিদ্রোহ ছিল এক ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন এবং এর চরিত্র ছিল হিংসাত্মক ও সশস্ত্র।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন কৃষক সমাজকে ভূমিহীন ও বিপন্ন করে তুলেছিল। ফলে তারা দলবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র যে শোষণের বি(দ্ধে সংগ্রাম শু(করে তা নয়—ঔপনিবেশিকতাবাদকেও তারা বিলোপ করতে বদ্ধ পরিকর হয়। এই প্রে(াপটে এক ধরনের ধর্মীয় আবরণও ল(িত হয়। এমন কিছু নেতার আবির্ভাব হয় যাদের ভাবমূর্তি ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারা ঈ(্বরের আশীর্বাদধন্য এবং বিদ্রোহীরা মনে করত এরা অলৌকিক (মতার অধিকারী। এরা বলতেন যে অতীতে সমাজে কোনও শোষণ ছিল না। এই ধরনের নিপীড়নহীন সমাজ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিতেন এইসব নেতারা। এই হিসাবে বলা যায় যে কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে এক ধরনের অতীতমুখিতা ছিল। উপরন্তু বিদ্রোহের নেতারা বলতেন যে ঈ(্বর যেহেতু তাদের প(ে কাজেই জয় অনিবার্য।

এই ধরনের বিদ্রোহকে ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে Millennial ও Messianic বলা হয়। Millennial শব্দটির অর্থ হাজার বছর। এই শব্দটির মধ্যে একটি তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে যাকে বলা হয় Judaco-christain তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথা হল সোনালী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। Messiah হচ্ছেন নিপীড়ন উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি(দাতা পু(ষের প্রতীক স্বরূপ। অনুমান করা হয় ভারতে আদিবাসী সমাজে এবং উপজাতি কৃষকদের মধ্যেও এই ধরনের মনোভাব দেখা গিয়েছিল। বীরসা মুন্ডার বিদ্রোহ এমনই একটি উদাহরণ।

কিছু কিছু বিদ্রোহ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার আনতে চেয়েছিল। এদের মধ্যে বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা মেদিনীপুরের লোধাদের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। আবার কোনও কোনও (ে্ত্রে কোনওরকম

প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ কৃষকরা জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন এদের হত্যা করেছিল—যাকে সামাজিক দস্যুতা বা Social banditry আখ্যা দেওয়া হয়। যেসব বিদ্রোহে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সেখানে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা যায়নি। সাধারণতঃ এই ধরনের গণ-অভ্যুত্থানগুলি শান্তিপূর্ণবাবে শু(হত। তবে শাসক সম্প্রদায় হিংসার আশ্রয় নিলে এই ধরনের গণ-অভ্যুত্থানগুলির হিংসাত্মক হয়ে উঠতে বেশি দেরী হত না।

২(খ).৪ নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত

ভারতে ব্রিটিশ নিপ্পেষণের বি(দ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল তাদের মধ্যে নীল বিদ্রোহ সবিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। নীল বিদ্রোহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নীল বিদ্রোহীরা আন্দোলন করেছিল নীলকুঠীর সাহেবদের বি(দ্ধে যারা কৃষকদের নিজেদের লাভের জন্য বাধ্য করেছিল নীল চাষ করতে। কাজেই নীল বিদ্রোহকারীদের প্রতিপ(ছিল নীলকর সাহেবরা—জমিদার বা মহাজন সম্প্রদায় নয়। এইখানেই অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের সাথে নীল বিদ্রোহের পার্থক্য।

নীল বিদ্রোহের কারণ ছিল কৃষকদের (োভ। নীল চাষ কৃষকদের প(লাভজনক ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পে যুগান্তরকারী উন্নতি পরিল(িত হয়। এই সময়ে যেহেতু কৃত্রিম নাল আবিষ্কৃত হয়নি, কাজেই কাপড় রঙ করার জন্যে ভারতীয় নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। বেন্টিংকের সময়ে ব্যাপকভাবে বাংলা ও বিহারে নীল চাষ শু(হয়।

নীলকর সাহেবরা কৃষকদের অগ্রিম দিয়ে বা দাদন দিয়ে নীল চাষ করাতো। কৃষকরা জমিদারের খাজনা মেটানোর জন্য দাদন নিত। কিন্তু নীলকররা জোর করে উৎকৃষ্ট জমিতে নীলবীজ বপন করতে চাষীদের বাধ্য করত। ফলে যে জমিতে চাষ করে কৃষকদের সারা বছরের অন্নের সংস্থান হতে পারত, সেই জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হওয়ায় তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। নীলকর সাহেবরা যে নীলচাষীদের উপর জোরজবরদস্তি করত তা নয়, তাদের আচরণও ছিল অশালীন। ইন্ডিগো কমিশনের রিপোর্টে এবং সমকালীন মিশনারীদের সা(্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন ধরেই কৃষক সমাজ নীলকর সাহেবদের বি(দ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তবে ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর কতকগুলি কারণও ছিল।

১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নীলকরদের পুঁজিতে টান ধরে। কারণ এই ব্যাঙ্ক ছিল তাদের টাকার যোগানদার। ফলে নীলকররা জমিদার হিসেবে অধিক অর্থ লাভের জন্য বেশি করে চাপ দিতে থাকে নীল চাষীদের উপর। নীলের দাম দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৪২ সালের পর থেকে নীলের বাজার পড়ে এসেছিল। কারণ নীল চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত হারে। ফলে যারা কম দামে নীল চাষ করাতে পেরেছিল তারাই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারছিল। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নীলচাষীদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায়। তারা টাকা পেত কম অথচ ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকে জিনিসের দাম বেড়েই চলছিল। এই প্রেক্ষিতে কৃষকরা নীল চাষ করতে অস্বীকৃত হয়। তারা ধান, চাল, ডাল, তৈলবীজ, আখ, তামাক বা অন্য কোনও লাভজনক জিনিস উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, হরিনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা নীলকরদের অত্যাচারের সবিশেষ বিবরণ হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠাতেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে নীলবিরোধী আবহাওয়া গড়ে ওঠে। দীনবন্ধু নিত্র নীলদর্পণ নাটকে নীলকরদের শোষণের এক প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন। জেমস্ লঙ-এর নামে এর ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছলে সেখানে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই নীলকরদের অত্যাচার সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। চারদিকে দেশীয় পত্র-পত্রিকায় নীলচাষের কুফল নিয়ে লেখালেখি হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি কারণ তখনও পর্যন্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে নীলের বাজার দর ছিল যথেষ্ট বেশি। কিন্তু নীলচাষের যখন গুরুত্ব কমে যায় তখন সরকারও নীলচাষীদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেয়। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন বলেন যে কৃষকরা তাদের জমিতে কি চাষ করবে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ঘোষণা কৃষকদের বিদ্রোহের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২(খ).৪.১ নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি

নীল বিদ্রোহ খুব দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৬০ সালের মধ্যে এই বিদ্রোহ যশোহর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, বারাসাত, মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহে নীলচাষীরা যে অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছিল নীলচাষের বিরুদ্ধে তা অভাবনীয়। তারা কোনও অবস্থাতেই নীল চাষ করবে না ঠিক করেছিল।

অনেকে মনে করেন যে বাজারে কৃত্রিমভাবে নীল তৈরি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই নীলচাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেন যে অন্তত ১৮৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কৃত্রিম নীলের কোন প্রভাব বুঝতে পারা যায়নি। বাংলায় নীলচাষীরা এতোই অনমনীয় ছিল যে নীলকর সাহেবরা বাধ্য হয়েছিল নীলের চাষ বিহারে সরিয়ে নিয়ে যেতে। অনেকে আবার চা বাগানে মূলধন বিনিয়োগ করে।

নীল চাষীরা যে শুধু জোর করে নীল চাষ বন্ধ করতে চেয়েছিল তা নয়। তারা সামগ্রিকভাবে নীল চাষ তুলে দিতে চেয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই ধরনের বৈপ্লবিক মনোভাব ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। উপরন্তু এই বিদ্রোহ বাংলায় প্রথম ধর্মঘটের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে এক হয়ে নীলচাষের বিরুদ্ধে

সোচ্চার প্রতিবাদ করা ধর্মঘটের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। এই বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত(। এই বিদ্রোহ ছিল আসলে কৃষকদের স্বার্থর(ার লড়াই। ধর্মের কোনও স্থান এই আন্দোলনে ছিল না।

খ্রিস্টান মিশনারীদের নীলচাষীদের প(এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নদীয়ার নীলচাষীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের বি(দ্ধে মিশনারীরা প্রতিবাদ করেছেন। তবে অভিজিৎ দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বুঝতে পেরেছিলেন নীলকরদের অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা (ু ণ্ণ করছে। সেই সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করার জন্যই তাঁদের এই নীলকর বিরোধিতা। এমনকি জেমস লঙ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পনের ইংরেজি অনুবাদ করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অ(য়কুমার দত্ত তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং ঈ(্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর পত্রিকায় নীলচাষীদের নিপীড়ন নিয়ে লিখেছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক প্রশংসনীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার অবদান। বস্তুত তাঁর পত্রিকার মাধ্যমেই সাহেবদের অত্যাচারের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

নীল বিদ্রোহের নেতৃত্বে কারা ছিলেন এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। একটা কথা পরিষ্কার যে নীলচাষ যাদের (তিগ্রস্ত করেছিল তারাই নীল বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। নীলকরদের পছন্দ করত না বা নীলবিদ্রোহের প্রতি নৈতিক সমর্থন ছিল এরকম অংশও নিতান্ত কম ছিল না। যেমন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক বা মিশনারীরা নীলবিদ্রোহ বা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে চিত্তব্রত পালিত নেতৃত্ব প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে এই বিদ্রোহে জমিদারদের আগ্রহ বেশি ছিল এবং এঁরাই নেতৃত্বের পুরোভাগে এগিয়ে আসেন। তবে এ(ত্রে সম্ভবত একটা স্বার্থের ব্যাপার লুকিয়ে ছিল। নীলকর সাহেবদের সম্পর্কে জমিদাররা তখনই অসন্তুষ্ট হয় যখন নীলকর সাহেবরা জমিদারের এলাকায় প্রজার উপর জমিদারের আধিপত্যে হস্ত(প করেছিল। অর্থাৎ কৃষক যে উদ্দেশ্য বিদ্রোহ করেছিল, জমিদারের নীলকর বিরোধিতার উদ্দেশ্য তা ছিল না। এঁরা ব্যক্তি(গত স্বার্থর(ার জন্য নীলবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে এঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাহলেও নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, রাণাঘাটের পালচৌধুরী পরিবারের গোপাল ও শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরী, হরনাথ রায়, নবকৃষ(পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব জমিদারদের নেতৃত্বের প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ মন্তব্য করেছেন যে জমিদাররা কখনই সম্পূর্ণ শক্তি(নিয়ে নীল বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন যে যদিও জমিদাররা নীলচাষ পছন্দ করতেন না এবং নীলকরদের সাথে তাদের সম্পর্কও বিশেষ ভালো ছিল না, বিদ্রোহের সংগঠনে তাঁদের হাত ছিল।

ইন্ডিগো কমিশনও এই রায় দিয়েছিল যে নীল বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে নীলচাষীদের সংগঠনেই গড়ে উঠেছিল। কারণ, তারাই ছিল সর্বাপে(া (তিগ্রস্ত। কাজেই নিজেদের দূরবস্থা দূর করার জন্য এরা সংগঠিত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, মিশনারীরা বা সরকারি কর্মচারীদের কেউ কেউ এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও মূল নেতৃত্ব এসেছিল ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। গ্রামের কিছু ধনী কৃষক ও মোড়ল যাঁরা এককালে নীলকর সাহেবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল তাদের অনেকেও বিদ্রোহের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। এদের উদ্দেশ্য ছিল নীলকর সাহেবদের সরিয়ে দিয়ে মহাজনী কারবার নিজেরাই যাতে আত্মসাৎ করে নিতে পারে।

প্রায় ৬০ ল(কৃষক এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। এই বিদ্রোহ শান্তিপূর্ণ ছিল না। কৃষকরা অস্ত্র শি(া করেছিল। নদীয় জেলায় বিদ্রোহে মহিলাদের অংশ নেওয়ার কথা জানতে পারা যায়। এই বিদ্রোহ বাংলা থেকে নীলকর সাহেবদের বাধ্য করেছিল নীলচাষ বন্ধ করে দিতে।

২(খ).৪.২ নীল বিদ্রোহের ফলাফল

নীলচাষীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিদ্রোহ শু(করলেও অবশেষে তা সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। কারণ নীলকর সাহেবরা বলপ্রয়োগ করে এই বিদ্রোহ ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। চাষীরাও তখন হিংসার পথে এগিয়ে যায়। এই বিদ্রোহ এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে বাংলার সরকার ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে একটি আইন জারী করতে বাধ্য হন। এই আইনে বলা হয় যে চুক্তি(অনুযায়ী যদি নীল চাষ না করা হয় তাহলে চুক্তি(ভঙ্গকারী শাস্তি পাবে। নীলকর সাহেবরা এই আইনের সুযোগ নিয়ে নীলচাষে অসহযোগী চাষীদের বিরুদ্ধে মামলা করে। বলাই বাহুল্য বিচারকরাও নীলকরদের স্বপ(রায় দিতেন।

কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় এই সময়ে এতো অনমনীয় হয়ে উঠেছিল যে আইনকে উপে(া করে তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে ১৮৬০ সালের আইন কার্যত বাতিল হয়ে যায়। নীল চাষ বাংলাদেশ থেকে উঠে যায়।

যদিও নীলবিদ্রোহে কৃষককুল সাফল্য লাভ করেছিল, তাহলেও অনেকে বলেন যে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের এই বিদ্রোহে বিশেষ লাভ হয়নি। গ্রামের মহাজন ও জোতদাররা নীলকর সাহেবদের পরিবর্তে কৃষককূলকে শোষণ করতে শু(করে। তবে বিনয় চৌধুরী মনে করেন যে বাংলাদেশের কৃষকরা নীলকর সাহেবদের এদেশে আসার থেকেই মহাজন ও জোতদারদের হাতে শোষিত হত। শোষণের এই ঘটনা নতুন কিছু নয়।

তবে নীল বিদ্রোহ বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তারা সচেতন হতে শু(করে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বটি এখানেই তৈরি হয়েছিল বলা যেতে পারে।

২(খ).৫ পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান

কৃষক অভ্যুত্থানের একটি গু(ত্বপূর্ণ নজীর ১৮৭৩ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বি(-ষণ করলেও একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে এই অভ্যুত্থান জমিদার বিরোধী এবং বর্ধিষ্ণু(কৃষক বা জোতদার শ্রেণী এই বিদ্রোহে জমিদারদের বি(দ্ধে এগিয়ে আসে।

পাবনার কৃষক অভ্যুত্থানের প্রে(াপট করলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে জমিদার সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত(শোষণ ও অত্যাচার এবং ত্র(মাগত কর বৃদ্ধি কৃষককুলকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

অধ্যাপক সুনীল সেন ''ভারতের কৃষক আন্দোলন''-এ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে করের পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বেড়ে যায়। তবে কোন অঞ্চলে কি পরিমাণে কর আদায় করা হত তার কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। ১৮৫৯ সালে যে আইন পাস হয় তাতে কর বৃদ্ধির সুযোগ কিছুটা কমে যায়। তখন জমিদাররা সরাসরি করের হার না বাড়িয়ে বিভিন্নভাবে বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করতেন। কৃষকরা তো বটেই, সরকারও এইভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়ের বিরোধী ছিলেন।

১৮৭২ সালে সরকার এই অবৈধ কর বা আবওয়াব বন্ধ করে দিলে জমিদাররা অন্য পথ অবলম্বন করে। তারা প্রজাদের মূল খাজনার সাথে এই বাড়তি টাকা জুড়ে আদায় করতে তৎপর হয়। এছাড়া জমিদাররা কৃষকদের জমি নতুন করে জরিপ করা শু(করে। এই জরিপ এমনভাবে হয় যে কৃষকদের জমির পরিমাণ আয়তনে হ্রাস পায়। সেই বাড়তি জমি দেওয়া হয় অন্য কৃষকদের এবং তা থেকে খাজনা আদায় করা শু(হয়। ফলে জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্ক হয়ে ওঠে তিক্ত(। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারির খাজনা পঞ্চাশভাগ বাড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাসক, পাবনার জেলা শাসকের জবানবন্দী এব তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে কৃষক সম্প্রদায়ের ((াভ এবং জমিদারদের অতিরিক্ত(খাজনা আদায়ের মনোবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, সোমপ্রকাশ, সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকাগুলি জমিদারদের উৎপীড়নের তীব্র সমালোচনা করে। চিত্রব্রত পালিত তাঁর ''Pabna Uprising a Fresh Probe'' প্রবন্ধে (Perspectives on Agrarian Bengal)-এ বলেছেন যদিও পাবনা বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল অধিক পরিমাণে খাজনা আদায় তাহলেও জমিদারদের একটা বিরাট অংশের খাজনা বাড়ানো ছাড়া কিছু করার ছিল না। ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ এই সমস্ত জেলার জমিদাররা অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে সম্পন্ন কৃষককুল বাণিজ্যিক ফসল পাট উৎপাদন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা, আরও বাড়িয়ে চলেছিল। অথচ খাজনার হার ছিল নিচু। ফলে অর্থ আদায়ের জন্য জমিদাররা বর্ধিত হারে খাজনার দায় তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত তাঁর ''Pabna Disturbance and the Politics of Rent'' লেখনীতে পাবনা বিদ্রোহের মূল কারণকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ১৮৫৯ সালে সরকার প্রণীত দশম আইন কৃষকদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। প্রজাস্বত্ব দিয়েছিল, কাজেই কৃষকরা মনে করেছিল যে জমিদাররা আর খাজনা বাড়াবে না। কিন্তু জমিদাররা তাদের খাজনা দশম আইনকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িয়ে চলেছিল। বাড়তি খাজনা না দিলে প্রজাস্বত্ব নাশেরও প্রয়াস ছিল। কৃষকরা তাদের প্রাপ্য অধিকারের উপর জমিদারের এই উপে(া মানতে রাজী ছিল না। ফলে তারা অভ্যুত্থানের পথ বেছে নেয়। অর্থাৎ কল্যাণ কুমার সেনগুপ্তের মতে পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বোধকে কেন্দ্র করে।

পাবনার কৃষকরা স্থির করে যে তারা কর দেবে না। তারা কৃষক সমিতি গড়ে তোলে। ১৮৭৩ সালে পাবনা জেলায় প্রায় সর্বত্র এই সমিতি গড়ে ওঠে। বি(ব্ধ প্রজারা এই সমিতিতে চাঁদা দিয়ে একটি অর্থভান্ডার গড়ে তুলেছিল। আদালতের মাধ্যমে তাদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মামলা মোকদ্দমায় যে খরচ হত তা মেটানো

হত এই অর্থভাণ্ডার থেকে। অনিচ্ছুক বিদ্রোহ বিরোধী প্রজাকে বিদ্রোহের সামিল হওয়ার জন্য বাধ্য করা হত। জমিদারদের বিরুদ্ধে পাবনার বিদ্রোহী ধনী কৃষকরা অত্যন্ত সুসংহতভাবে সংগঠন করে তুলেছিল। সম্পন্ন কৃষকরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিল। এইসব নেতাদের মধ্যে দৌলতপুরের ঈষাণচন্দ্র রায়, মেঘুল্লা গ্রামের প্রধান শম্ভুনাথ পাল ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ধরনের ছিল তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিনয় চৌধুরী এবং সুপ্রকাশ রায়ের মতে এই অভ্যুত্থান ছিল হিংসাত্মক। আবার কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন যে এর অনেকটাই ছিল আইনের লড়াই। সরকার প্রথমদিকে জমিদার বিরোধী ও বিদ্রোহীদের প(থাকলেও পরবর্তীকালে তারা জমিদারদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে বিদ্রোহী নেতারা ধৃত হয় এবং নেতৃত্বের অভাবে অভ্যুত্থান ত্র(মশঃ থিতিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান কিন্তু জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্ককে আইনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এসেছিল। এই অভ্যুত্থানই ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের পথ প্রস্তুত করেছিল যার ফলে কৃষকরা অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে এই অভ্যুত্থান জমিদারদের শোষণের বি(দ্ধে। এই অভ্যুত্থান ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। কাজেই তারা কৃষকদের স্বার্থর(ায় ব্রতী হয়েছিলেন। অনেকে পাবনার কৃষক বিদ্রোহকে একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ বলতে চেয়েছেন—যেহেতু জমিদাররা ছিলেন হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষকরা ছিল মুসলমান। কিন্তু প্রকৃতপ(ঘটনাটি ভিন্ন। কারণ হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়গত বিরোধ হলে হিন্দু নেতা ঈষাণ চন্দ্র রায় বা শম্ভুনাথ পাল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিকে এগিয়ে আসতেন না। এই বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপে(। ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মীয় অত্যাচারের কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক।

২(খ).৬ মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ

সরকারি নথিপত্রে মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহকে Deccan Riot আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৫ সালে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে মহারাষ্ট্রে কৃষক অভ্যুত্থানের কথা জানতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের সংগ্রাম ছিল মহাজনী শোষণের বি(দ্ধে। এই বিদ্রোহের প্রে(াপটে ছিল রায়তওয়ারী ব্যবস্থার বৈষম্য—যার ফলে কৃষকদের উপরে অত্যাধিক করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। কৃষকদের খাজনা দেওয়ার (মতার যথার্থ্য বিচার না করেই তাদের উপরে করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের সম্যক ধারণা ছিল না। অনুর্বর ও রু(জমিতে পর্যাপ্ত শস্য যে উৎপাদন করা যায় না একথা সরকার ভেবে দেখেনি। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যও উৎপাদন ব্যাহত হত। অথচ তার জন্য খাজনায় কোন ছাড় দেওয়া হত না। অগত্যা খাজনা মেটানোর জন্য কৃষকদের শরণাপন্ন হতে হত মহাজন সম্প্রদায়ের কাছে। এইভাবে মহারাষ্ট্রের কৃষক জীবনে মহাজনদের প্রবেশ ঘটেছিল।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থার আগে মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ জীবনে মহাজনরা ব্যবসা করত। তাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কৃষকরা ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে জমির উপর ব্যক্তি(গত মালিকানা লাভ করেছিল। ইচ্ছামত জমি বন্ধক দিতে বা বিকর করতে তাদের কোনও অসুবিধা ছিল না। রাজস্ব দিতে না পারলেই তারা মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করত। অনেকে বলেছেন যে কৃষকরা তাদের সামাজিক ত্রি(য়াকর্মে সাধ্যাতীত খরচ করত। তার জন্যেও তারা মহাজরে কাছে ঋণ করত। একবার তারা এই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া ছিল অসম্ভব। তখন তাদের জমি চলে যেত মহাজনের হাতে— কারণ ঋণ শোধ করার (মতা অধিকাংশ কৃষকদের ছিল না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে সেখানকার তুলো রপ্তানি বন্ধ হলে ইংলন্ডে ভারতীয় তুলোর চাহিদা দেখা দেয়। চাষীরা মহাজনদের কাছে ধার করেও এই তুলোর চাষ করতে থাকে।

রবীন্দ্রকুমার তাঁর The Deccan Riot of 1875-এ দেখিয়েছেন যে, মহারাষ্ট্রের কৃষক অভ্যুত্থানের জন্য কেবলমাত্র মহাজন ও কৃষকদের তিক্ত(সম্পর্কেই দায়ী ছিল না। একাধিক কারণ এই বি(োভের জন্য দায়ী। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ভারত থেকে তুলো যেত ইংল্যান্ডে বস্ত্র শিল্প বয়নের জন্য। কিন্তু গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা থেকে তুলো আবার পাওয়ার ফলে ভারতে তুলোর দাম পড়ে যায়। মহারাষ্ট্র থেকে তুলো যেত। কাজেই মহারাষ্ট্রের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। এই অবস্থায় সরকার খাজনার হার বৃদ্ধি করলে কুনবি অর্থাৎ কৃষক ও বনি অর্থাৎ গ্রামীণ মহাজনদের সম্পর্কের মধ্যে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। মহাজনরা ইতিমধ্যে অধিকাংশ কৃষককে তাদের ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে এই কথা ভেবে যে কৃষকরা সম্ভবতঃ খাজনা দিতে না পারলে তাদের জমিগুলি সরকার অধিগ্রহণ করবে। কাজেই নিজেদের স্বার্থর(ার জন্য তারা কৃষককুলকে প্ররোচিত করতে থাকে নানাভাবে। এমনকি তারা কৃষকদের ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এইভাবে এক উত্তেজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার মূল কারণ ছিল নিপীড়ন।

অনেকের মতে আবার মহারাষ্ট্রে কৃষক অভ্যুত্থানে স্থানীয় মহাজনরা উপল(্য ছিল না। এই অভ্যুত্থান হয়েছিল বহিরাগত মাড়োয়ারী ও গুজরাটি মহাজন (সাহুকরদের) বি(দ্ধে। স্থানীয় মহাজনেরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের কারবার চালিয়েছে মহারাষ্ট্রে। জমি দখল করতেও তাদের আগ্রহ নিতান্ত কম ছিল না। বরং মারোয়ারী ও গুজরাটি মহাজনরা কৃষকদের জমি দখলের ভয় দেখাত যাতে তারা ঋণ শোধ করে। কাজেই মহারাষ্ট্রের কৃষকরা যে তাদের আত্র(মণের ল(্য করেছিল বহিরাগতদের এটা নিতান্তই জাতিগত পার্থক্যের জন্য। কৃষকরা এদের ঋণপত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিল। তবে সব গুজরাটি বা মাড়োয়ারি বহিরাগত ছিল তা নয়। এদের মধ্যে অনেকে দু-তিন পু(ষ ধরে মহারাষ্ট্রে বাস করছিল। স্থানীয় মহাজনরাও যে আত্র(ান্ত হয়েছিল সে প্রমাণও পাওয়া যায়। সরকার এই বিদ্রোহ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করায় সমগ্র মহারাষ্ট্র এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কেঙ্গলিয়া নামে এক নেতা। সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। কেঙ্গলিয়া অবশেষে ধরা পড়েন।

ডেভিড হার্ডিম্যান বলেছেন যে মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৭৫ সালের মে মাসে। এইসময়ে কৃষকদের সবচেয়ে বেশি টাকার দরকার পড়ে। কারণ গ্রীষ্মকাল তাদের টাকার দরকার লাগে বেশি। কিন্তু ১৮৭৫ সালের মে মাসে মহাজনরা কৃষকদের ঋণ দিতে অস্বীকৃত হলে বিদ্রোহের স্ফুরণ ঘটেছিল।

মহারাষ্ট্রের কৃষকরা মনে করেছিল ঋণপত্র পুড়িয়ে ফেললেই মহাজনদের নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ সরকার কঠোর হাতে দমন করেন এবং কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হল না। এর সঙ্গে শু(হয় দুর্ভি(। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছল চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, ইংরেজি শি(তে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে খান্দেশ ও নাসিক জেলার রামোশী, ভিল, কোলি ও ধাঙরদের এক করে ব্রিটিশ উৎখাত করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একটি দল গঠন করেন। দরিদ্র নীচু জাতি অধ্যুষিত এই দলে কিছু ব্রাহ্মণও ছিল। এরা লুটপাঠ করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যাকে Eric Hobsbawn বলেছেন Social banditry। তিনি ধরা পড়লে দৌলতা রামোশী ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত জমিদার ও সাহুকরদের বি(দ্ধে তার অন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে সরকার ১৮৭৯ সালে Deccan Agriculturists Relief Act পাস করেন। ফলে মহাজনদের সুদের কারবার যেমন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়, তেমনই কৃষকদের স্বার্থও কিছু পরিমাণে র(ার ব্যবস্থা করা হয়।

২(খ).৭ উপজাতি বিদ্রোহের পটভূমিকা

কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় বা উপজাতিগুলির বিদ্রোহ ঊনবিংশ-শতকের ব্রিটিশ ও মহাজনী শোষণের বি(দ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রি(য়া। ব্রিটিশরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে আদিবাসীরা মূল জনস্রোত থেকে দূরে সরে গিয়ে তাদের ধর্মীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতি নীতি বজায় রাখত। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী জীবনে মহাজনের কোনও ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পর থেকে তাদের নিজস্ব সমাজ ও অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে। আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও অসিত্বের সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমঝোতা মেনে নিতে পারেনি, বলেই ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছিল। এই সংগ্রাম শুধুমাত্র শোষণ বা সাম্রাজ্যবাদের বি(দ্ধে নয়, এই সংগ্রাম নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। এইখানেই উপজাতি বা আদিবাসী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য।

উপজাতি সম্প্রদায়ের সর্বাপে(া বড়ো ((োভ ছিল যে তাদের অরণ্য সম্পদের উপর ব্রিটিশ সরকারের হস্ত(েপ। আদিবাসী কৃষকগোষ্ঠী অনেক(েত্রেই মাটি কর্ষণ করত না—তারা ঝুম প্রথায় চাষ করত। অর্থাৎ জঙ্গলের কিছু অংশে আগুন লাগিয়ে ছাই করে উর্বর জমি তৈরী হত। সেখানে চাষ করা হত। সমগ্র অরণ্য অঞ্চল জুড়ে তারা কখনই চাষ করত না। অরণ্য সম্পদ র(ার প্রতি তাদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অরণ্য সংর(ণের নামে ঝুম চাষ বন্ধ করে দেয়। এতে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আদিবাসী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অতীতের সুখকর দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। এই আন্দোলন সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় revitalization movement বা পুন(ভ্যত্থানবাদী আন্দোলন। এই সময়ে এমন কিছু নেতার আবির্ভাব হয় যাকে সাধারণ লোক মনে করত যে তাঁরা অলৌকিক (মতার অধিকারী। তাদের উপর আনুগত্য প্রদর্শন করে আদিবাসী সম্প্রদায় বিদেশী শাসন ও মহাজনী শোষণের হাত থেকে মুক্তি(পেতে চেয়েছিল এবং একই সঙ্গে ফিরে পেতে চেয়েছিল অতীতের সোনালি দিনগুলি। এইভাবে সমাজ ও অর্থনৈতিক অসন্তুষ্টির সাথে সাথে আদিবাসী আন্দোলনে একটা ধর্মাশ্রয়ী রূপরেখাও দেখা দিয়েছিল।

২(খ).৭.১ খারওয়ার বিদ্রোহ

আদিবাসী সমাজ মূলত সংগ্রাম করেছিল শোষণ ও অস্তিত্ব র(ার কারণে। ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল সিধু কান্হু। কিন্তু এই আন্দোলন যা সমগ্র সাঁওতাল পরগণায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল—অবশেষে, ব্রিটিশ দমননীতির কাছে পরাস্ত হয়। সরকার চেষ্টা করেছিল তাদের সমস্যার সমাধান করতে। এমনকি মহাজনদের কয়েক বছরের জন্য সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই ধরনের পদ(েপ সাঁওতালদের খুশি করতে পারেনি। তারা বহিরাগতদের, যাদের তারা দিকু বলত এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।

১৮৭০ সালে এই ধরনের হতাশার মধ্য থেকে সূত্রপাত হয় খারওয়ার আন্দোলনের। পূর্বে সাঁওতালরা কিন্তু খারওয়ার নামেই পরিচিত ছিল। খারওয়ার শব্দটি ব্যবহার করে বোঝান হয়েছিল যে এমন একটা দিন ছিল যখন তারা ছিল স্বাধীন এবং দিকুরা তাদের স্বাতন্ত্র্য (ু্ণ্ণ করেনি। এই আন্দোলনের এই অতীতমুখীতা এটাকে পুন(ভ্যুত্থানবাদী মনোভাব নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে। এছাড়া কোনও রাজনৈতিক নেতা কিন্তু খারওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেনি। ধর্মীয় মোড়কে এই আন্দোলনকে গড়ে তোলা হয়েছিল। উপজাতি আন্দোলনের এটা একটা বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। এইসব ধর্মীয় নেতারা সহজ সরল সাঁওতালদের কাছে একথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে দিকুদের সংস্পর্শে তাদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই তা সংশোধন করে অতীতের স্বাধীন মুক্ত(দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে হবে।

এইসব ধর্মীয় নেতাদের খারওয়ার আন্দোলনের বলা হত বাবাজী। ১৮৭০ সালে ভগীরথ মাঝি নামে একজন বাবাজী বিশাল এক জনসভায় সাঁওতালদের কর দিতে বারণ করেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই পদ(েপের সাথে সাথে ধর্মীয় কিছু আচরণবিধি পালনের কথাও বলা হয় এই জনসভায়। ভগীরথ মাঝি বিশুদ্ধিকরণের কথা বলেন। কাজেই সাঁওতালদের শূকর ও মুরগী খেতে বারণ করা হয়। দুটোই বিধর্মীদের খাদ্য। কাজেই এইসব খাদ্যাভ্যাস সাঁওতালদের (তি করেছে। ভগীরথ মাঝি আরও বলেন যে তার কিছু অলৌকিক (মতা আছে। ব্রিটিশ সরকার তাকে বন্দী করতে পারবে না। সুদিন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খায় সাঁওতালরা উত্তাল হয়ে ওঠে। এইভাবে খারওয়ার আন্দোলন শু(হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ভগীরথকে তারা বন্দী করেন। কিন্তু জ্ঞান পরগণাইত নামে আর একজন নেতা খারওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। সরকার এই আন্দোলনকেও প্রতিহত করেন। ১৮৮০ সালে দুবিয়া গোঁসাই খারওয়ার আন্দোলন আবার শু(করেন। তিনিও বন্দী হন। ১৮৯৬-৯৭ সালে ফতে সাঁওতাল খারওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। তিনিও কারা(দ্ধ হন।

বারবার ব্যর্থ হওয়ার ফলে বাবাজীরা তাদের ঐ(্বরিক (মতা সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন তার সম্পর্কে সাঁওতালদের মনে অবি(্বাস জন্মায়। উপরন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও মহাজনী শোষণের হাত থেকে মুক্তি(পাওয়া যে জীবনের স্বপ্ন খারওয়ার বিদ্রোহের নেতারা দেখিয়েছিলেন তাও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। সাফাই, সমরা ও বাবাজী এই তিনটি সম্প্রদায়ে তারা বিভক্ত(হয়ে পড়েছিল।

খারওয়ার আন্দোলন সাঁওতালদের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাহলেও ঔপনিবেশিকতাবাদের বি(দ্ধে তারা যে পদ(ে প নিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাদের কর বয়কট না করার সিদ্ধান্তও ছিল অভিনব। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতারাও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

২(খ).৭.১ মুণ্ডা বিদ্রোহ

আদিবাসী বিদ্রোহের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল ছোটনাগপুরের মুন্ডা বিদ্রোহ। এদের প্রাচীন জীবনযাত্রা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ। তারাও আরণ্যক ছিল সাঁওতালদের মতো। জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ করত। জমির মালিকানা ছিল যৌথ। এই ভূমি ব্যবস্থাকে বলা হত খুণ্ড কটিদার। এদের সমাজে সবাই যেহেতু জমির মালিক— কাজেই কেউ কেউকে খাজনা দিত না। এরা নিজেদের মধ্যে থেকেই একজন গ্রাম প্রধান নির্বাচন করত— তাকে বলা হত মুন্ডা। গ্রাম্য পুরোহিতদের খুণ্ড কটিদাররা বলত পাহান।

ব্রিটিশ শাসন ও তার আনুষঙ্গিক উপসর্গ মহাজনী শোষণ ও দিকুদের আগমন মুন্ডাদের খুন্ডকটিদার ভূমি ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তাদের রাজস্ব দিতে বলা হয়। অরণ্য সংর(ণের নামে বন কেটে বসত তৈরী নিষিদ্ধ হয়। ফলে খাজনা মেটানোর জন্য মুন্ডাদের মহাজন সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হতে হয়। এইভাবে মুন্ডাদের আরণ্যক জীবনযাত্রায় বহিরাগত বা দিকুদের প্রবেশ ঘটে ও শোষণ শু(হয়। ঋণের দায়ে তাদের জমিগুলি ত্র(মশই দিকুদের হাতে চলে যায়। প্রশাসন ছিল শোষণকারীদের প(ে।

১৮৪৫ সাল থেকে ছোটনাগপুর অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীদের ঢুকতে থাকে। এইসব মিশনারীরা মুন্ডাদের মহাজনী শোষণের হাত থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য ও জমি উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে বলে। এতে কোনও ফল হয়নি।

ত্র(মশ মুন্ডাদের মধ্যে এক জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে। মুন্ডাদের অনেকেই খ্রিস্ট ধর্মে দী(িত হয়ে ভেবেছিল মহাজনী শোষণের হাত থেকে মুক্তি(পাবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের দুর্দশা দূর করতে

মিশনারীদের ব্যর্থতা মুন্ডাদের হতাশ করে তোলে। কিন্তু মিশনারীদের সংস্পর্শ তাদের মধ্যে এক স্বাধীনতাকামী সত্তা গড়ে তুলেছিল যার ফলে মিশনারীদের স্কুলে লেখাপড়া করা বীরসা মুন্ডা শোষণের বি(দ্ধে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন।

বীরসা মুণ্ডার আদর্শের মধ্যে বৈষ(বীয় প্রভাব পরিলা(িত হয়। তার আখড়া ছিল চালকা। সরকারের বনবিভাগ ১৮৯৩-৯৪ সালে মুন্ডাদের কিছু পতিত জমি নেওয়ার চেষ্টা করলে বীরসা প্রতিবাদ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি নাকি ঈ(রের নির্দেশ পান বলা হয়। ব্রিটিশ সরকার বীরসার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তাকে বন্দী করেন। ফলে মুন্ডা সমাজে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। দুবছর পরে মুক্তি(পেয়ে বীরসা সরাসরি দিকুদের বি(দ্ধে আন্দোলন নেমে পড়েন। ১৮৯৯—১৯০০ সালে রাঁচী ও সিংভূম জেলা জুড়ে বীরসার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বীরসাকে কোন অলৌকিক শক্তি(ব্রিটিশদের হাত থেকে র(া করতে পারেনি। তিনি ধরা পড়েন এবং ব্রিটিশ কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

তবে বীরসার আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। ১৯০৮ সালে Chota Nagpur Tenancy Act পাস হয়। বলা হয় যে মুন্ডাদের জমি অন্য কেউ নিতে পারবে না। বেট বেগার বা বিনা মজুরীতে মুন্ডাদের কাজ করানো যাবে না। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মুন্ডাদের সম্পর্কে সরকারের প্রজা আইন প্রণয়নের পূর্বেই তাদের নব্বই শতাংশ জমি দিকুদের হাতে চলে গিয়েছিল। সেগুলো উদ্ধারের কোনও নির্দেশ কিন্তু সরকার দেননি।

২(খ).৭.১ ওঁরাও বিক্ষোভ

ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা ছিল মুন্ডাদের মতো আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের সমাজেও খ্রিস্টান ও হিন্দুধর্মের প্রভাব পরিলা(িত হয়। মুন্ডাদের মতো ওঁরাওরা মহাজনী শোষণের শিকার হয়েছিল। তবে তাদের ভূমি ব্যবস্থা যৌথ মালিকানা ব্যাপারটা প্রচলিত ছিল না। ওঁরাও আন্দোলনের নেতৃত্বেও দেখা যায় পুন(ভ্যত্থানবাদী মনোভাবের প্রতিফলন এবং বিশুদ্ধীকরণের মাধ্যমে অতীতের শোষণমুক্ত(দিনগুলি ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন।

১৯১৪ সালে ওঁরাওদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন গুমলা মহকুমার অন্তর্গত, বিযুণপুর থানার অধীন ২৫ বছরের যুবক মাত্রা ওঁরাও। তিনি বলেন যে ওঁরাওদের দেবতা ধর্মেশ তাকে দেখা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ওঁরাওদের কিছু রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। ভূত প্রেতের পূজা, ঝাড়ফুঁক করা, মদ্যপান, মাংস খাওয়া, পশুবলি ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। নাচগান করা চলবে না। চাষবাসও তারা করবে না—কারণ এতে তাদের দুঃখ ঘোচে না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তারা অপরের দ্বারস্থ হয়ে কুলির কাজও করতে পারবে না। অচিরেই তাদের দুঃখ দূর হবে এবং ওঁরাওদের স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।

ওঁরাওদের ধর্ম সম্পর্কে দুর্বলতা বা বলা যেতে পারে আদিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে দুর্বলতা খুব সহজেই এই নির্দেশগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলে। উপরন্তু এর মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া ছিল ভগবানের নির্দেশ মানলে স্বাধীন ওঁরাও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। ফলে ওঁরাওরা সরকার ও মহাজন বিরোধী বিদ্রোহে যোগ দেয়। সরকার যাত্রা ওঁরাও ও তার অনুগামীদের বন্দী করলেও ওঁরাওদের আন্দোলন কিন্তু ভেঙে যায়নি। পালামৌ, হাজারীবাগেও

এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আসামের চা বাগানের ওঁরাওরা এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে চা বাগানের কুলীর কাজ ছেড়ে দেয়।

ওঁরাওদের এই নতুন ধর্মাদর্শের নাম ছিল কুড়ুখ ধরম। কারণ ওঁরাওদের অপর নাম ছিল কুড়ুখ।

১৯১৭ সালের শেষাশেষি ওঁরাওদের আন্দোলন ভেঙে পড়তে থাকে। ব্রিটিশরা পুনরায় ওঁরাও সমাজে তাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

২(খ).৮ উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে যখন আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার বিব্রত সেই সময়ে মালাবার অঞ্চলের মুসলমান কৃষক মোপলাদের অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বি(াভের ইতিহাসে আর একটি গু(ত্বপূর্ণ সংযোজন। মোপলারা ১৮৩৬ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বারবার বিদ্রোহ করেছিল। এদের মনোভাব ছিল অনমনীয় এবং প্রয়োজনে এরা হিংসার পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করত না। উপরন্তু এদের বিদ্রোহের মধ্যে আদিবাসী বিদ্রোহীদের মতো ধর্মীয় বাতাবরণ উপস্থিত ছিল।

জমিদারী শোষণ ও অত্যাচার মোপলাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। মোপলাদের দুর্দশার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ভূমি সংত্র(ান্ত নীতিকে দায়ী করা যায়। ইংরেজরা ১৭৯২ সালে মালাবার অঞ্চল দখল করে হিন্দুদের প্রচুর জমি ও (মতা দেয়। ফলে মুসলমান কৃষকরা জমির উপর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ তখন থেকেই তাদের মধ্যে বঞ্চনার ইতিহাস শু(হয়। জমিদাররা জমি থেকে তাদের উৎখাত করার জন্য নির্মম অত্যাচার করত। এদের মধ্যে অনেকে আবার মহাজনী কারবারও করত। অর্থাৎ ভূমিহীন মোপলারা বেঁচে থাকার জন্য তাদের কাছ থেকেই ঋণ নিত।

কনরাড উড তাঁর লেখা "Peasant Revolt : An Interpretation of Moplah Violence in the 19th and 20th Centuries"-এ বলেছেন যে, মোপলারা যখন আর্থিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত, সেই সময়ে তাদের ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ধর্ম তাদের ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করেছিল। অস্পৃশ্য চে(মারদের অনেকেই হিন্দু সমাজের জাতপাতের কড়াকড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমান হয়েছিল। ফলে মোপলাদের সংখ্যা ত্র(মশ বেড়ে চলেছিল। বিদ্রোহীরা মিলিত হত মসজিদে। মোপলারা জমিদারদের (জম্মি) সম্পত্তি ধ্বংস করে, মন্দির ভাঙচুর করে ও জদিদারদের হত্যা করে তাদের প্রতিবাদ জানাত। কনরাড উডের মতে এই বিদ্রোহ মূলত হিন্দু জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ। এরা সংঘবদ্ধভাবে কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠা করে আইনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন পরিচালিত করার কথা চিন্তা করেনি।

ডি.এইচ. ধানাগাড়ে— Agrarian Conflict, Religion and Politics—The Moplah Rebellions in 19th and 20th Centuries-এ মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু কৃষকরা কিন্তু জমিদারদের বি(দ্ধে কোনও সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব দেয়নি। তারা শুধু মাঝে মাঝে দস্যুবৃত্তি করেছে।

তবে ডেভিড আরনল্ড—Islam, the Mapillas and the Peasant Revolt in Malabar-এ বলেছেন যে মোপলাদের আন্দোলনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সুন্দর ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন। তারা শোষণহীন মুক্ত(সমাজ গড়ে তোলার জন্যই জমিদার বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল যে বাইরে থেকে তাদের সাহায্যের জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসছে।

দ(িণ মালাবারের এই কৃষক বিদ্রোহকে ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় সমস্যা হিসাবেই গণ্য করেছিল। এছাড়া মুসলমান কৃষকরা হিন্দু জমিদারদের বি(দ্ধে লড়াই করায় আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় চরিত্রই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালে যখন এই বিদ্রোহ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন ব্রিটিশ সরকার মোপলাদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিছু আইন প্রণয়ন করেছিল। ১৯২৯ সালে জমির উপর মোপলাদের বৈধ অধিকার স্বীকৃত হয়। এরপর আর কোনও মোপলা বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

২(খ).৯ অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বিদ্রোহ

দ(িণ রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম গুজরাটের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি আন্দোলন স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ১৮৬৮ সালে গুজরাটের পাঁচমহল অঞ্চলের নায়েকদা উপজাতির লোকেরা রূপসিং গোবরের নেতৃত্বে থানা আত্র(মণ করেছিল। এদের আরেকজন নেতা ছিলেন জোরিয়া। গোবিন্দ গু(১৯১৩ সালে এক ধরনের শুদ্ধি আন্দোলন শু(করেন। তাকে প্রভাবিত করেছিল সম্ভবত হিন্দু ধর্ম। রাজস্থানের বাঁসওয়ারা, সুনু এবং দলুগড়পুর অঞ্চলে এবং গুজরাটের পাঁচমহলে ভীলরা স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে বিদ্রোহ শু(করেছিল। কিন্তু এই অভ্যুত্থান সফল হতে পারেনি।

গোদাবরী অঞ্চলে বাস করত কোয়া, কোণ্ড, ভোরা ও কোন্ধ উপজাতি সম্প্রদায়। এদের পরিধি ছিল বাস্তার, মালকানগিরি ও কোরাপুটের মধ্যে। বিদ্রোহীদের মূল কেন্দ্র ছিল চোডাভরম্ বা রাম্পা রাজ্য ও গুডেম অঞ্চল।

এই অঞ্চলের আদিবাসীরা ঝুম প্রথায় চাষ করত। স্থানীয় ভাষায় এই ধরনের চাষকে বলা হত পোড়ু। রাম্পা অঞ্চলের প্রশাসন তাদের অরণ্যের উপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। জঙ্গলে কাঠ কাটা বা পশু চরানোর জন্য তাদের কর দিতে বলা হয়। উপজাতিরা তাদের সর্দার বা মুট্টাদারদের নেতৃত্বে বার বার বিদ্রোহ করে।

১৮৭৯-৮০ সালে মুট্টাদারদের বি(োভ তীব্র হয়ে উঠেছিল। রাম্পা অঞ্চল মাদ্রাজের আবগারি আইনের আওতায় পড়ার ফলে তাড়ির উপর কর ধার্য হয়। এছাড়া বহিরাগত ব্যবসাদার ও মহাজন যাদের এরা কোম্‌তি বলত তাদের অত্যাচারও ত্র(মশ বাড়তে শু(করেছিল। পুলিশের অত্যাচার এর সঙ্গে যুক্ত(হয়ে মুট্টাদারদের (োভ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তারা ধরে নিয়েছিল জমিদার ও মহাজনী শোষণ সরকারের মদত পুষ্ট।

মুট্টাদাররা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্থানীয় মানুষরা মুট্টাদারদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করলেও মুট্টাদারদের জন্য আবগারী আইন শিথিল করতে বাধ্য হয়। মুট্টাদারদের রাম্পার শাসককে রাজস্ব না দিয়ে সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেবে স্থির হয়। রাম্পার তেলেগু গ্রামপ্রধান বা গ্রামের সর্বোচ্চ শাসক যাদের মনসবদার বলা হত তাদের প্রশাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ প্রশাসন ভেবেছিল এই পরিবর্তনগুলি মুট্টাদারদের সন্তুষ্ট করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপ(সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠল। মুট্টাদার ও ব্রিটিশ সরকারের মাঝে কোনও প(না থাকায় মুট্টাদাররা সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা শু(করে। এই পরিস্থিতিতে মুট্টাদারদের বশ করার জন্যে ১৮৯২ সালে তাদের ভাতার বন্দোবস্ত হয়। এর ফলে উপজাতিরা মুট্টাদারদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন হয়ে ওঠে ধর্মাশ্রয়ী। ১৮৮৬ সালে সুরলা রমল্লা ও রজলা অনন্তাইয়া নিজেদের রাম ও হনুমানের অবতার রূপে চিহ্নি(ত করেন। এদের অনুগত বাহিনীর নাম হয় রামদন্দু বা রামের বাহিনী। এরা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। কোরামাল্লাইয়া বলে একজন নিজেকে পঞ্চ পান্ডবদের একজন অবতার বলে ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন তার শিশুসন্তান স্বয়ং কৃষ(ভগবান। তিনিও বিট্রিশদের উচ্ছেদ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরা নানারকম অলৌকিক শক্তি(র অধিকারী বলে নিজেদের ঘোষণা করতেন। কার্যত কোনটাই অবশ্য প্রমাণিত হয়নি।

১৯২২ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত রাম্পা অঞ্চলে আবার ব্রিটিশ-বিরোধী আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জঙ্গল ও পাহাড়ে রাস্তা তৈরির কাজে সরকার উপজাতিদের জোর করে কাজ করতে বাধ্য করেছিল। আল্লার শ্রীরাম রাজু নামে জনৈক ব্যক্তি(এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যদিও তিনি উপজাতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যদিও তিনি উপজাতি আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন, তাহলেও তিনি কিন্তু উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত(ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র সাদা চামড়ার লোকদের ঘৃণা করতেন। ভারতীয়রা সেনাবাহিনীতে থাকলেও তিনি তাদের আত্র(মণ করতেন না। জনসাধারণ এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোয় ব্রিটিশ প্রশাসনকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

দ(িণ অন্ধের কুড্ডাপ্পা ও নেলোর জেলার অন্তর্গত নামালাই পর্বতের চিঞ্চু উপজাতির মানুষরা ১৮৯৮ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে শু(করেছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকার তাদের ঝুম চাষ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং অরণ্যের উপর তাদের অধিকারকে খর্ব করেছিলেন। রাস্তার অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরোধিতা করে নেতৃত্ব দিয়েচিলেন একজন প্রাক্ত(ন দেওয়ান। যদিও উপজাতিদের সম্পর্কে মমত্ব বোধ অপে(া বাস্তারের রাজ সিংহাসনের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি।

১৯১৪ সালে উড়িষ্যার দাসপালিয়া অঞ্চলে খোন্দ উপজাতিরাও ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের সামিল হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার উপজাতি আন্দোলনগুলি সামরিক শক্তি(র সাহায্যে দমন করলেও একটা তথ্য প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশ প্রশাসন উপজাতিদের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি।

২(খ).১০ সারাংশ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক সম্প্রদায় আদিবাসী গোষ্ঠী, অরণ্য পর্বতের উপজাতিরা শোষণের বি(দ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তাদের ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রে(াপট ছিল আর্থ সামাজিক। শোষণ ও নিপীড়ন ছিল (োভের মূল উৎস। মানুষকে তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই ছিল (োবের মূল কারণ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল এক বিচিত্র ধর্মীয় আবরণ যা তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সুখময় অতীত ফিরিয়ে আনার। আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে আনলেও একটা কথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল শোষণ ও নিপীড়নকে জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না।

২(খ).১১ অনুশীলনী

ক। বড় প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বি(দ্ধে সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

২। নীল বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার কি পদ(েপ নিয়েছিল।

৩। পাবনার কৃষক বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৪। মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহের বৈশিষ্টতা কোথায়?

৫। উপজাতি আন্দোলনগুলির বিশিষ্টতা কোথায়?

৬। খারওয়ার অভ্যুত্থান সম্পর্কে লিখুন।

৭। টীকা লিখুন ঃ

মুন্ডা বিদ্রোহ, ওঁরাওঁ বিদ্রোহ, উপজাতি আন্দোলনে মুট্টাদারদের ভূমিকা।

৮। মোপলা বিদ্রোহের কারণ বি(-ষণ ক(ন।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দিকু কাদের বলা হত?

২। Social bandiry বা সামাজিক দস্যুতা বলতে কি বোঝায়?

৩। কুনবি ও বনি শব্দ দুটির অর্থ কি?

৪। খুণ্ডকটিদার বলতে কি বোঝায়?

৫। 'কুড়ুখ ধরম' কি?

৬। মোপলা বলতে কাদের বোঝায়?

৭। ‘পোড়ু’ শব্দটির অর্থ কি?

৮। কোম্‌তি কাদের বলা হত?

২(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bipan Chandra—Modern India.
2. Anil Seal—Emergency of Indian Nationalism, Dharma Kumar (ed) Cambridge Economic History of India.
3. R.C. Majumdar (ed). British Paramountey and Indian Renaissance, Part-II.
4. B.B. Chaudhury—Peasant Movements in Bengal 1850-1900 in 19th Century Studies No. 3 Indian Peasant edited by Dr. Alok Ray.
5. Abhijit Dutta—Christian Missionaries on the Indigo question in Bengal.
6. Ranajit Guha—Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
7. Chittabrata Palit—Tensions in Bengal Rural Society. Perspectives of Agrarian Bengal.
8. K.K. Sengupta—Pabna Disturbance and the Polities of Rent.
9. Sumit Sarkar—Modern India.
10. R. Kumar—The Decan Riot of 1875 in Hardiman D.—(ed) Peasant Resistance in India 1858-1914.
11. Conrad Wood—Peasant Revolt ; “An Interpretation of Moplah Violence in the 19th and 20th Centuries “in Hardiman. D. (ed). Peasant Resistance in India.
12. D.H. Dhanagare—Agrarian Conflict, Religion and Politics : The Moplah Rehellions in 19th and 20th Centuries—Past and Present, 1977.
13. David Arnold—Islam, the Mopilas and the Peasant Revolt in Malabar.
14. সুনীল সেন—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ।
15. সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।